'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ যেসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন, সেগুলি হল—

(১) বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের অবস্থা ঃ প্রত্যেক বছর ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেকানিকাল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার জন্য যেসব শিক্ষার্থী যায় তাদের প্রাথমিক শিক্ষার অভাবটা বেশি করে চোখে পড়ে। তাদের এই বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রত্যাগত এক ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ লেখককে জানিয়েছেন, প্রস্তুতির অভাবের জন্য বিদেশে ভারতীয় ছাত্ররা আধুনিক ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি চালাতে খুব ত্রস্ত বোধ করে।

(২) আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ত্রুটি ও ব্যর্থতা ঃ আমাদের শিক্ষার ব্যপক অপচয়ের জন্য দায়ী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন পদ্ধতির ত্রুটি। এই অপচয় দূর করার জন্য আমাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার সন্ধান ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। লেখক জানিয়েছেন—(ক) আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন একান্ত জরুরি, (খ) স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান একান্ত জরুরি।

(৩) শিক্ষা ব্যবস্থার সার্থকতার জন্য মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ঃ শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার হলে, অনুসন্ধিৎসু ছাত্র যেমন মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করতে

Scanned with CamScanner

সক্ষম হয় না। শিক্ষকও তেমন নিশ্চিত হতে পারেন না এই ভেবে যে, ছাত্রকে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা ঠিক বোঝাতে পেরেছেন কিনা। লেখক জানিয়েছেন, বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা জোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না-এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।' অনেকে মনে করেন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হলে 'বিদ্যায়তনিক চলাচল ব্যহত হবে এবং প্রাদেশিকতা প্রাধান্য লাভ করবে। যাঁরা মধ্যযুগীয় আদর্শ ছেড়ে বের হয়ে আসতে পারেন না তাঁরাই এমন চিন্তার আবর্তনে আবর্তিত হয়ে চলেছেন বলে লেখকের বিশ্বাস, বাস্তবকে মেনে নিতে হলে, শিক্ষা-ব্যবস্থার সার্থকতার জন্য মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য।

(৪) পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা ঃ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন সাধন করার শিক্ষা লাভ করতে আমরা সমর্থ হই নি। যারা মধ্যযুগীয় আদর্শ নিজেদের ছেড়ে বের হয়ে আসতে পারেন না, তাঁরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন সাধন করতে চান না। তাঁরা প্রচলিত দর্শকেই শ্রেয় জ্ঞান করে থাকেন। বিজ্ঞানের উপযোগিতাকে স্বীকার করলেও আধুনিক বিজ্ঞানীদের তারা সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁরা বিজ্ঞানের সত্য দর্শককে মেনে নিতে চান না তারা বিশ্বাস করেন অহিংসা দর্শনে। আমাদের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের উপাদান হিসেবে তাঁরা বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব দেন নি, তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন ক্লাসিকস্ চর্চায়, প্লেটো-অ্যারিস্টটল, হিউম্যানিটিজ, ভাষা, আইন শিক্ষার উপরে। পাঠ্য বিষয়কে এই মধ্যযুগীয় বিস্বাস থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলতে না পারলে শিক্ষার যথাযথ বিকাশ সম্ভব নয়।

(৫) ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃতি এবং পারলৌকিকতা শিক্ষাদান প্রসঙ্গ ঃ গণতান্ত্রিক দেশে ইতিহাস শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যেকের মতামতের উপর মূল্য দেওয়া হয়। তাই ভারতীয় সভ্যতার অবনতির কারণ প্রসঙ্গে একাধিক ব্যাখ্যা আসা স্বাভাবিক। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও দর্শন চর্চায় বিজ্ঞান অবহেলিত হয়ে থাকায় আমাদের যুক্তিবাদী মন তৈরি হয়ে ওঠে নি, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটেনি। পারলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা অতিমাত্রায় ব্যস্ত থেকেছে। আর এর ফলে আমরা এখন অতিমাত্রায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি। মানুষ এখন ধর্ম বলতে অনুষ্ঠান সর্বস্ব প্রথা ধর্মকে বোঝে। প্রথাধর্ম সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। আচার সর্বস্ব প্রথাধর্ম হল সাম্প্রদায়িকতার প্রধান উৎস। তাই মানুষ এখন ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ধর্মীয় পর্থক্যকে বড় করে তুলেছে। ধার্মিক অন্য ধর্মের মানুষকে খুন করে স্বর্গে যেতে চাইলেও বিজ্ঞানী সেই স্বর্গকে আড়ি দিয়ে অবলীলায় অট্টহাসি হাসতে পারেন। যথার্থ শিক্ষার অভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক মানুষ যখন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে একটি ভৌগলিক এলাকায় বসবাস করে তখন সেটি সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের কখনও স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। তাই সমাজের অগ্রগতি ছাড়া ব্যক্তি মানুষের অগ্রগত সম্ভব নয়। মানুষের কর্মজীবন সামাজিক জীবনেরই অংশ। ধার্মিকদের কথা মতো কোনো মানুষ স্বর্গে যাবে নাকি নরকে যাবে তা নিয়ে মানবসমাজের লাভ লোকসান কিছু নেই। ব্যক্তি মানুষের স্বর্গে কিংবা নরকে থাকার সঙ্গে সমাজের উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই। অপরদিকে ধর্মীয় বৈরিতায় গুজরাটে যখন ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সৃষ্টি হয় তখন দু'হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়, মন্দির ও মসজিদ বিতর্ক চরম সীমা ছাড়িয়ে যায়, গির্জার সামনে জিপে ঘুমন্ত স্টেইনস ও তার শিশুপুত্রকে ধর্মের

Scanned with CamScanner

নামে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়, তখন ব্যক্তির ধর্মের পাপ-পুণ্য আর ব্যক্তির ধর্মে সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন তা বহু মানুষের দুঃখ লাঞ্ছনার কারণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক নেই, অপরদিকে ব্যক্তির সৎ ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড়। স্বর্গ বা নরকের জীবন ব্যক্তির নিজের জীবন, ব্যক্তির লাভ-লোকসানের সঙ্গে তার সম্পর্ক, অপরদিকে সমাজের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে সমষ্টির উন্নতি ও অবনতির সম্পর্ক। সমাজ ব্যক্তির লাভ-লোকসান দেখবে না, দেখবে সমষ্টির লাভ-ক্ষতি, মানবতার লাভ-ক্ষতি। ব্যক্তি মানুষ সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত হতে না পারলে মানবতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। পারলৌকিকতার শিক্ষা কখনও ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে না। এর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে ধারাবাহিক ভাবে পারলৌকিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, সামাজিক জীবন নিয়ে ভাবে নি। লেখক জানিয়েছেন, 'ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে।' সমাজের উন্নতির জন্য দেশের উন্নতির জন্য আধুনিককালের ভারতীয়কে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার পাঠ গ্রহণ করতে হবে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে তার ব্যক্তি জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। তাকে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা উচিত নয়। বস্তুবাদী দার্শনিক বলতে পারেন, পারলৌকিকতা জড়ত্ব, স্বার্থপরতা এবং লোভের প্রকৃষ্ট জন্মভূমি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বাধ্য আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত করে এবং এই উভয়কেই মিলিয়ে আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি, তখন আমরা মানবধর্ম বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তার সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।' অথচ মানুষ ভালো-মন্দ, যুক্তি বিশ্লেষণ ভুলে গিয়ে মেষের মতে অন্ধ অনুসরণ আর গতানুগতিকতাকেই চরম সত্য বলে মনে করে। বুদ্ধিহীন মেষের মতো বুদ্ধিমান মানুষ যে ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে সমাজে চলেছে সেই ঐতিহ্যের গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করে। বেঁচে থাকা আর পরকালের চিন্তার মধ্যেও জীবনের সার্থকতা নেই। জীবনের সার্থকতা আছে মানবধর্মের মধ্যে। আমাদের প্রচলিত ধারণা, যারা নিজ নিজ ধর্মের নিয়মনীতি মেনে চলেন, তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবার অধিকারী হন, আর যারা অধর্মের কাজ করেন তাদের স্থান হয় নরকে। কিন্তু খোলা মন নিয়ে বাস্তব জগতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ভালো কাজে করেই আমরা এই জগৎ সংসারকে স্বর্গভূমিতে রূপান্তরিত করতে পারি। কবির কথা দিয়ে বলা যায়—'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক? / কেবলে তা বহুদুর / মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক / মানুষেতে সুরাসুর।' বিবেকানন্দ মোক্ষের ওপরে স্থান দিয়েছেন দুর্গত মানবের সেবাকে। অলৌকিক মোক্ষ সমস্যা বাড়িয়ে চলে, অপরদিকে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ মানবতার সমাজের উন্নতি ঘটায় সহজ সরল সম্পর্কের মধ্যে ভূমানন্দের যে আস্বাদ গ্রহণ করা যায়। সেই বস্তব সুখ-দুঃখের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার বিচিত্র জীবলীলা প্রকাশ পায়। মোক্ষের চাইতে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা অনেক বেশি জরুরি। স্বর্গে দুধের নদ-নদী থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে আছে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারি, অভাব। মানুষের অলীক স্বর্গ সুখের কল্পনা অপেক্ষা যেটা বাস্তব তা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। সেজন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা-দান একান্ত জরুরি। ধার্মিকরা স্বর্গকে সুখদায়ক বলে মনে করে বলে বাস্তব পৃথিবীকে ভালোবাসে না। কিন্তু মানুষের বাসভূমি হল বাস্তব পৃথিবী।

Scanned with CamScanner

মানব জাতির সুন্দর বিকাশের জন্য বাস্তব পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। তাই পৃথিবীর ভালো-মন্দের সঙ্গে মানবজাতির ভালো-মন্দের সম্পর্ক, ব্যক্তি মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে তা মানব জাতির দুশ্চিন্তার বিষয় হতে পারে না। তার সঙ্গে মানব জাতির অস্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনের সার্থকতা আছে কর্মের মধ্যে। ঈশ্বরকে না মেনেও বুদ্ধদেব কোটি কোটি মানুষের আরাধ্য হয়েছিলেন।

(৬) জাপানের বাস্তবমুখী শিক্ষা-পদ্ধতির ভারতবর্ষে প্রয়োগ প্রসঙ্গ ঃ জাপানের বাস্তবমুখী শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে ভারতবর্ষের মানুষের ব্যাপক উন্নতি সম্ভব বলে লেখকের বিশ্বাস। ভারতবর্ষের কাছাকাছি সময়ে জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হলেও, আধুনিক রাষ্ট্র জাপানের অগ্রগতি সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার বস্তু হয়ে উঠেছে। লেখক জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগ দেওয়ার ফলে সেখানে আমেরিকার দার্শনিক, যুগোস্লাভিয়ার গণিতবিদ্ এবং জাপানী গণিতবিদ্, পদার্থবিদ্, জীববিদ্, দার্শনিক ও বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। অধিকাংশ জাপানী বিজ্ঞানীরা ইংরাজি কিংবা আরও কয়েকটি ভাষা বুঝতে পারলেও, সমস্ত দেশ জুড়ে সেখানে জাপানী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চলে। ফলে সেখানে লেখককে জাপানী ভাষা শোনার জন্য তৈরি থাকতে হয়। লেখক অবাক হয়ে দেখলেন যে আধুনিক রাষ্ট্র জাপানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে জটিল ও বিমূর্ত আলোচনা জাপানী ভাষায় অনায়াসেই চালানো সম্ভব হল। বিদেশীরা সেখানে যখন বক্তৃতা দান করলেন জাপানীরা তখন সহজেই বিদেশীদের চিন্তাসূত্র ধরতে পারলেন। জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে লেখকের আলাপ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লেখক দেখেছেন, জাপানী ভাষায় পদার্থবিদ্যায় আধুনিকতম দিকগুলি পড়ানো হচ্ছে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা মাতৃভাষায় করেন। লেখক জানতে পারলেন, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্বন্ধে দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরেজিতে লেখা একটি গ্রন্থের জাপানী অনুবাদ সেদেশে প্রকাশিত হয়েছে এবং ছ'মাসের মধ্যে সেই গ্রন্থ প্রায় তিন হাজার বিক্রি হয়েছে। শুধু জাপানী ভাষা পড়তে পারে এমন সাধারণ জাপানীরা পারমানবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানতে সেখানে বিশেষ আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে তারা অন্যদের চাইতে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকে বেশি বিশ্বাস করেন। সেখানে আমাদের দেশে ওইসব বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা লিখে চলেছেন ইংরাজিতে, আর তার ফলে ভারতের শতকরা আশি ভাগ মানুষকে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে তাঁরা অজ্ঞ রেখেছেন। কিছু মানুষ উচ্চশিক্ষিত হলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হয় না, সেখানে সকল মানুষ যদি লিখতে পড়তে পারে তবে দেশের উন্নতি অনেক বেশি ত্বরান্বিত হয়। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতি দ্রুত হওয়া সম্ভব, জাপান থেকে সে শিক্ষা লাভ করেছেন লেখক। 'মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবন্ধে' সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, 'জাপানে কম করে নয় বৎসর শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ছেলে ও মেয়েকে স্কুলে পাঠনো হয়। প্রায় সকলেরই স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। এর জন্য কারুর পয়সা লাগে না। নীচের দিকে খরচ জোগায় দেশের মিউনিসিপ্যালিটি কিংবা আমাদের দেশের মতোই জেলা অথবা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তারাই খরচার বেশির ভাগ দিয়ে থাকে। শিল্পকলা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, সেগুলির ভার নিয়েছে সরকার। তাছাড়া উপরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশির ভাগ সরকারি পয়সায় চলেছে। আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে হয়তো কোনো একটা বিদেশি ভাষার ওপর নির্ভর করে জাপানে

Scanned with CamScanner

বিজ্ঞান কিংবা শিল্পকলা শেখানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে আমার সে ধারণা ভুল। আমি অনেক বই জোগাড় করেছিলাম। তার অধিকাংশতেই জাপানীতে লেখা।' ইংরাজির উপর জোর দিলে দেশে শিক্ষাবিস্তারে বাধার সৃষ্টি হবে। সকলে বুঝতে পারে এমন ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে জাপান অসাধারণ উন্নতি করেছে। সেই পথে চললে ভারতবর্ষের উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী।

(৭) পরিভাষা সৃষ্টি ও প্রয়োগ প্রসঙ্গ ঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, 'পরিভাষা ভাষারই প্রকারভেদ; উহা কল্পিত ভাষা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত ভাষা।' চিকিৎসা-শাস্ত্রে, অর্থনীতিতে, দর্শন-শাস্ত্রে, রাজনীতিতে, সাহিত্যতত্ত্বে প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, যা শুধুমাত্র অভিধানের গন্ডীতে বাঁধা থাকে না। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ জন ম্যাকের ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা রচনার শুভ সূচনা করেন। এর পর পরিভাষা রচনা করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'A scheme for Rendering Europian Scientific Terms into Vernacular of India' রচনা করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'পরিভাষা সংসদ' কর্তৃক 'সরকারী কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা—প্রথম স্তবক প্রকাশিত হয়। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন 'গত দেড়শো বছর ধরে পরিভাষা রচনার চেষ্টা কম হয় নি। সেই মূলধন নিয়েই আপাতত কাজে লেগে যেতে পারে। ....পরিভাষা অনেকটা ধাতুর মতো। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়ে ব্যবহারিক অর্থই অধিক গণ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশ থেকে নেওয়া। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে যে নামে চিহ্নিত করেছে, সেই তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে আমরা সেই নাম সমেত গ্রহণ করছি। সেই নামের প্রতিশব্দ সন্ধান করা অনেকটা টেলিফোনকে দুরাভাস যন্ত্র বলার মতোই বাতুলতা। অপরের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস অপরের দেওয়া নামেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিদ্যার ও বৃত্তির নিয়মিত চর্চার ফলে বাংলা পরিভাষা যথাকালে দেখা দেবে। ততদিন পর্যন্ত ইংরেজি পরিভাষাকে অন্ত্যজ জ্ঞান করার কোনো কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ইংরেজি পরিভাষা যদি বাংলায় সাজ বদল করে, তাতে বাংলারই লাভ।' ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি' গঠন করেন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সরকারী কাজে ব্যবহৃত পরিভাষা প্রথম স্তবক' প্রকাশ করার পর ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় স্তবক এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় স্তবক প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৬০ সালে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'পরিভাষা সংসদ' গঠিত হলে সেই সংসদ থেকে চতুর্থ স্তবক ও পঞ্চম স্তবক প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালে সুকুমার সেই এই সংসদের সভাপতি হন। তথাপি পরিভাষা যথাযথ না থাকার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চায় অসুবিধে হবে বলে সত্যেন্দ্রনাথ কখনও মনে করেন নি। তিনি ইংরেজি টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে জানিয়েছেন, 'গোড়ায় বিদেশী উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন বহু শব্দ এখন ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও। আশা করি বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনি ভাবে কাজে লাগানো হবে এবং আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের রূপান্তর ঘটবে শেষপর্যন্ত।' এমন কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দ আছে, যাদের তর্জমা করে কোনো লাভ নেই বলে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন, যেমন—রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, থার্মোমিটার, ইলেকট্রন,

Scanned with CamScanner

ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। এমন সব শব্দগুলির ব্যবহারে কোনো অসুবিধা থাকা উচিত নয় বলেই প্রাবন্ধিক মনে করেছেন।

(৮) ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব শিক্ষাদান প্রসঙ্গ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা বলেছেন, যার বিশেষ ঝোঁক থাকবে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া। তাতে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হবার সম্ভাবনা থাকবে।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয়ে যথার্থ মানবতার শিক্ষাদান প্রসঙ্গ ঃ মানবতা জাগ্রত হলে মানব-সমাজের উন্নতিদান সম্ভব। মানবতার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মানুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। আমাদের জাতীয় পতাকাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উঁচু করে তুলে ধরার জন্য আমাদের সকলকে মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে। কেবলমাত্র বিদ্যা দান এবং জ্ঞানের অগ্রগতির সহায়তা দান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র-বংশমর্যাদার সব ভেদাভেদ ভুলিয়ে সকলকে এক ছাতার তলায় এনে দাঁড় করানোর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে। 'জাতের নামে বজ্জাতি'কে দমন করার জন্য নজরুল 'শ্মশান শবের ছাইয়ের গাদায়' খুঁজে ফিরেছেন 'ভাঙন দেব শিব'কে। কালাতীত মানুষকে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে মিলনের বাঁশি শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, —'গাহি সাম্যের গান। যেথায় আসিয়া এক হয়ে গেছে। সব বাধা ব্যবধান। যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ / মুসলিম-খ্রীশ্চান।' মানুষই যে পরম সত্য এই জ্ঞানটা সবার আগে হওয়া দরকার। আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রকে মিলিতভাবে প্রচার করতে হবে। সবার উপরে মানুষ সত্য। রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' কাব্যের ৭২ সংখ্যক কবিতার অন্তরের যে প্রার্থনা জানিয়েছেন, সেই প্রার্থনা সত্যেন্দ্রনাথও করেছেন। মানবতার মধ্যে ভারতবর্ষের হীনতা, ক্লেদ ও গ্লানিমা দূর করতে চেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি স্বদেশ প্রেমের উন্নত আদর্শের অন্বেষণ করেছেন। জীবনের সংকীর্ণতা থেকে সরে এসে মানুষকে সব রকমের ভয় থেকে মুক্ত হতে বলেছেন। অধঃপতিত ভারতের চিত্তের জাগরণের জন্য প্রাবন্ধিক যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞানে এবং নির্ভীক চিত্তের আশা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথের কাছেও মানবিক মাহাত্ম্যের আর্দশই 'স্বর্গ' বলে পরিগণিত হয়েছে—

'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত কারি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।'

রচনারীতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ সত্যেন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী। বিজ্ঞানের নিরিখে বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে ভালোবাসতেন। সাধারণ পাঠক যাতে তাঁর লেখা আত্মস্থ করতে পারেন, সেজন্য তিনি সহজ, সরল, সাবলীল চলিত গদ্যরীতিকে অবলম্বন করেছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ। যুক্তি-বিশ্লেষণের অনবদ্যতার সঙ্গে উপস্থাপনরীতির চমৎকারিত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তব পটভূমিকে তিনি বাস্তব দৃষ্টি দিয়েই বিচার করিতে ভালোবাসতেন। সমস্যা, সমাধানের উপায় যেমন তিনি নির্দেশ করেছেন, তেমন সমস্যার জন্য দায়ী কারা, সেদিকেও নিরপেক্ষভাবে সমীক্ষা করেছেন। পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতার অপূর্ব সমন্বয়ে প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষালয়ের অবস্থা, ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিমান মানুষের পারলৌকিক চিন্তা ও পলায়নবাদী মানসিকতাকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের কশাঘাতে বিদ্ধ করতেও পিছপা হন নি। যেমন—'নালান্দা ও তক্ষশীলার মতো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে সে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত—য

Scanned with CamScanner

ছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মেরুদণ্ডস্বরূপ তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত শাশ্বত সত্যের অতন্দ্র মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপরে। এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং পৃথিবীকে দু-দিনের পান্থশালা মনে করতে সক্ষম হতেন। আর এই উপলব্ধি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলত এই জীবনের দুর্ভোগ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। এ ধরনের মনন চিন্তনের দার্শনিক উৎকর্ষের আমরা যতই তারিফ করি না কেন একথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, এ জগৎ দু-দিনের পান্থশালা, ক্রমাগত এই প্রচার পার্থিব ব্যাপারে ঔদাসীন্যের উদ্রেক করেছে। ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যাপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে।' শিক্ষায় পরিভাষার প্রয়োগ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'অনেক সময়ে বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বাধা সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানচর্চার। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজি টেকনিক্যালি ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ওই শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ হিসাবেই তা টিকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভান্ডার।'

সাধারণ পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তুলনামূলক আলোচনা প্রবন্ধের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয়। সত্যেন্দ্রনাথের তা জানা ছিল বলেই, ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনা করতে গিয়ে জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে জাপানের রেশ টেনে তিনি বলেছেন, 'জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও দেখা হল। গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেখানে পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম দিকগুলিও পড়ানো হচ্ছে জাপানী ভাষায় আর তারই পাশাপাশি জাপানী ছাত্রেরা চালাচ্ছেন বহু দুঃসাহসী ও অভিনব গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন মাতৃভাষায়।'

সুচিন্তিত অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য ব্যবহার করে প্রবন্ধটিকে লেখক অনায়াসে শিল্পগুণ সম্পন্ন করে তুলতে পেরেছেন। যেমন—'শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞনিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাঁদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো বিদেশী ভাষা এসে দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই।' বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক যেভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তা একান্তভাবেই লেখকের প্রাবন্ধিক সত্ত্বার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে। যেমন—

(১) 'বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা যোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।'

(২) 'গণতান্ত্রিক দেশে ইতিহাসের শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে তার পাঠ ও ব্যাখ্যার স্বাধীনতা থাকে। অতএব ভারতীয় সভ্যতার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।'

(৩) 'কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে।'

'অতন্দ্রমনন', 'নিদিধ্যাসন'-এর মত গুরুগম্ভীর দেশী শব্দের প্রয়োগ যেমন করেছেন, তেমন 'পেপার' 'চেয়ার' ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ, 'ওয়াকিবহাল', 'কায়েম' ইত্যাদি। আরবি শব্দ অবলীলায়

Scanned with CamScanner

প্রয়োগ করেছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বাণী প্রচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যের ৭২ সংখ্যক কবিতার প্রয়োগ করে প্রবন্ধের উপসংহারকে অনেক বেশি অলঙ্কারসমৃদ্ধ ও প্রাণোচ্ছল করে তুলতে পেরেছেন। শিক্ষক ঋষি ও ছাত্র ঋত্বিকের মিলনকে করে তুলেছেন সার্থক।

Scanned with CamScanner